রসুইঘরের রোয়াক ২য় খণ্ড

রসুইঘরের রোয়াক ২য় খণ্ড

স্মৃতি ভদ্র

http:// rokomari.com/nalonda
অথবা
ফোনে অর্ডার করতে ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১
হট লাইন ১৬২৯৭
অথবা
www. boibazar.com
হট লাইন ০৯৬১১২৬২০২০

রসুইঘরের রোয়াক ২য় খণ্ড	স্মৃতি ভদ্র
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
	নালন্দা
	৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট)
	তৃতীয় তলা, ঢাকা ১১০০
স্বত্ব	লেখক
প্রচ্ছদ	রাজিব দত্ত
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৫৫০.০০ টাকা
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট নিউ ইয়র্ক
ভারত পরিবেশক	নয়া উদ্যোগ

©	Writer
Rasuigharer Rouk	Smriti Vhadra
Cover Design	Rajib Datta
First Pubished	February 2024
Publisher	Redwanur Rahman Jewel
	Nalonda
	38/4 Banglabazar (Mannan Market)
	2nd Floor, Dhaka 1100
Price	550.00 Tk only
ISBN	978-984-98390-6-4
E-mail	nalonda71 @gmail.com

উ ৎ স র্গ

রসুইঘরের রোয়াকের সকল পাঠককে
যারা নিজেদের হাওয়াই মিঠাই শৈশব বারবার আবিষ্কার করেছে
এই লেখার প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি বাক্যে।

সূচি

রসুইঘরের রোয়াক আশ্চর্য এক টাইমমেশিন # ৯
পাতায় মোড়া ইলিশ, লাউপাতায় সর্ষে মাখা ইলিশ ভাপা # ১৩
সাবুর ফলার; নানারকম ফল, দুধ আর ক্ষীরের সন্দেশ দিয়ে মাখানো সাবুদানা # ১৮
শাক চচ্চড়ি, কুমড়ো শাক আর চিংড়ি মাছের সর্ষে চচ্চড়ি # ২২
লাল সুরুয়া, শুকনো মরিচ বাটায় রান্না করা মাংস # ২৭
খইয়ের বড়া, নারিকেল আর খই দিয়ে বানানো মিষ্টি বড়া # ৩৪
ছানার পায়েস: দুধ, চিনির সিরা আর গোলাপ জলে রান্না করা পায়েস # ৩৮
মৌরি মুরগি, মৌরি বাটায় মুরগি আর পেঁপের ঝোল # ৪৫
ঝিঙেশ্বরী, মটর ডালের বড়া আর সর্ষে বাটায় ঝিঙের ঝোল # ৫০
চিংড়ি পাতুরি: কলাপাতায় মুড়িয়ে নারিকেল আরসর্ষে বাটায় চিংড়ি মাছ ভাপা # ৫৫
তালশাঁসের পায়েস: সাবুদানা, দুধ আর নারিকেলের সাথে তালশাঁস মিশিয়ে বানানো পায়েস # ৬০
মানকচু আর জিরাবাটায় চিংড়ি মাছের লাল রসা # ৬৬
বেলে পাতুরি, সর্ষে আর কাঁচা মরিচ বাটায় লাউপাতায় মোড়া বেলে মাছের ভাপা # ৭২
মাছের টক, সর্ষে বাটা আর ছেঁচা কাঁচা আমে কোরাল মাছের গা মাখা ঝোল # ৭৭
ইলিশ কচুভাপা, কচুপাতায় ইলিশমাছ ভাপা # ৮৪
কুমড়ো দম্পক: মিঠে কুমড়ো আর ঝিঙে নারিকেল বাটায় দমে রান্না # ৯১
ডালচিংড়ির রসজ: মৌরি বাটায় গুঁড়ো আরগোটা মাসকলাই ডাল দিয়ে চিংড়ি মাছের ঘন রসা # ৯৭
পাতাপোড়া পিঠা, কলাপাতায় মোড়ানো তালের পিঠা # ১০২
আদা মাগুর, আদা বাটায় মাগুরমাছের সাদা ঝোল # ১০৭
লাল চিড়ার পুলি, লাল চিড়া আর নারিকেলের পুলি # ১১১
তিল পিঠা: সাদা তিল, নারিকেল আর কাদম্বিনী চালের সুগন্ধি পিঠা # ১১৫
কাতলের মরিচ পোড়া: রাঁধুনি ফোড়নে লাউ আর কাতল মাছের পাতলা ঝোল # ১১৯
শাক বিরিঞ্চি: নারিকেল আর ডালের বড়ি দিয়ে কলমি শাকের ঘণ্ট # ১২৫
তেল পাবদা, বেগুন আর পটোল দিয়ে কালিজিরা ফোড়নে পাবদা মাছের ঝোল # ১৩০
কই-মৌলি, মৌরি বাটায় কইমাছ আর শিমের বিচি দিয়ে লাল ঝোল # ১৩৫
ডাল শুক্তো: মাসকলাই ডাল আর পুঁইশাকের শুক্তো # ১৩৯
উচ্ছে পাতার বড়া: দু-রকম ডাল বাটায়উচ্ছে পাতা মিশিয়ে বানানো বড়া # ১৪৩
পুঁই মেটুলির চচ্চড়ি: সর্ষে বাটায় পুঁই মেটুলি আর নানা রকম সবজির চচ্চড়ি # ১৪৮
মাছ শুক্তো: আদা বাটায় তাপসীমাছ আর বথুয়া শাকের ঘণ্ট # ১৫৪
মৌরি মুরগি ২: মৌরি বাটায় মুরগির লাল সালুন # ১৬০
গোলেনূর দাদির ধুপি পিঠা, গুড় আর চালের গুঁড়ায় বানানো ভাপে সেদ্ধ পিঠা # ১৬৬
আমপটোল, সর্ষে বাটায় পটোল আর কাঁচা আমের টক # ১৭৪
বাঁধাকপির পাতুরি, সর্ষে আর নারিকেল বাটায় কলাপাতায় রান্না করা পাতুরি # ১৮০
মাছ মইলু, কালিজিরা বাটায় মাছের পাতলা ঝোল # ১৮৭
পেরাকির পায়েস, তিলের ক্ষীরশায় বানানো পুলির পায়েস # ১৯৪

রসুইঘরের রোয়াক আশ্চর্য এক টাইমমেশিন

শৈশব আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অধ্যায়। শৈশবের গল্পগুলো ভারি মায়া ছড়ায়। তাই বুঝি জীবনের শতেক টানাপোড়েন কিংবা জটিলতাও পারে না শৈশবের মায়া মুছে দিতে। তাই যেকোনো স্মৃতিচরিতে লেখকদের শৈশব যেভাবেই উপস্থাপিত হোক না কেন অস্বস্তি তৈরি হলেও সেগুলো পাঠে অনীহা তৈরি হয় না। আমরা আজীবন শৈশব আঁকড়ে থাকতে ভালোবাসি। কথাসাহিত্যিক মাহমুদুল হক যথার্থই বলেছেন, 'আসলে জীবন মানেই শৈশব; জীবনভর মানুষ এই একটা ঐশ্বর্যই ভাঙিয়ে খায়, আর কোনো পুঁজিবাট্টা নেই তার।' সময় উজিয়ে পরিণত বয়সে পৌঁছেও শৈশবের কাছে যেকোনো অজুহাতে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাই বুঝি ফুরায় না। কিন্তু টাইমমেশিন ছাড়া সেখানে পৌঁছানোরই বা উপায় কী! সুলিখিত একটি বই এক্ষেত্রে হয়তো উষ্ণ উদ্ধারের মাধ্যম হতে পারে। যে বইটির হাতধরে আমরা পৌঁছে যেতে পারি কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

সুলিখিত একটি বই নামের টাইমমেশিন অনায়াসে পৌঁছে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত কোনো গন্তব্যে; এমনকি আরাধ্য শৈশবেও। স্মৃতি ভদ্রের লেখা *রসুইঘরের রোয়াক* বইটিকে আমার সেরকম এক টাইমমেশিনই মনে হয়েছে। যেখানে লেখক তাঁর আনন্দময় শৈশবের নানা কাহিনি বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁর বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা আমাদের একেবারেই অপরিচিত মনে হয়না। তাই বিশ্বাস করি এর আবেদনও সর্বজনীন।

তবে এই বইটিকে ঠিক আত্মচরিত বলা হবে, না স্মৃতিকথা, নাকি কালচারাল এনথ্রোপলজির শাখায় রাখা হবে, তার ভার সময়ের ওপর রইল। বইটি জুড়ে রয়েছে সাত বছরের এক বালিকার চোখে দেখা প্রাণবন্ত গ্রামীণ আর নিরালা শহুরে জীবনের বৃত্তান্ত। ঋতুর পালাবদলে নানা উৎসব-পালাপার্বণ ঘিরে রসুইঘরের জাঁকাল সব আয়োজন। পারিবারিক আর চারপাশের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে মনোহর ভাষায়। সারল্য এ বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

রসুইঘরের রোয়াক ঘিরে স্মৃতি ভদ্র কেবল তাঁর পরিবার আর শৈশবের গল্প কিংবা জিবে জল গড়ানো খাবারদাবারের বয়ানই শোনান না। একই সঙ্গে বাংলার গ্রামীণ জীবনে প্রচলিত এমন অনেক শব্দ-বাক্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—যেগুলোর ব্যবহার আজকাল তেমন আর চোখে পড়ে না। বাংলার বহু গ্রামীণ সংস্কৃতি, ব্রত, আচার-আচরণ, যা লুপ্তপ্রায়, রসুইঘরের রোয়াকে সেগুলো জীবন্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মনকাড়া একেকটি রান্নার শিরোনাম দিয়ে বইটির নানা পর্ব সেজে উঠলেও এটি আদৌও রান্নাবান্না কেন্দ্রিক কোনো রেসিপি বই নয়। যদিও এটি গল্পের বই নয় সত্যি। তা না হলেও যেহেতু সব ধরনের আর্টফর্মে গল্পের একটা ভূমিকা থাকে, এখানেও সেটার ব্যত্যয় ঘটেনি। লেখক সারল্যমাখা ভাষার জাদুতে গ্রামের বাড়ি ও শহরের বাসা, বাইরবাড়ি আর ভেতরবাড়ির গল্প শুনিয়েছেন। যেখানে উঠোন জুড়ে গাছের ছায়া মেখে মা, ঠাকুমা, বড় দাদি, দাদু, গুলেনূর দাদি মনিপিসি, কহিনূর ফুপু, মুসা, মইনুল চাচা, মুসার মাসহ অন্যান্যদের আন্তরিক সম্মেলন। যে গল্পে কাঁটাতার নেই, ভেদ-বিভেদের বিষাক্ত কামড় নেই। আনন্দমাখা আর ভীষণ মানবিক এক বাতাবরণে আনন্দ নাড়ু খেতে থাকা সাত বছরের আদুরে মেয়েটির মতো নিপাট সরলতায় সময় গড়িয়েছে, জীবন বয়ে গেছে। বিপর্যয়ের উল্লেখ যে বইতে আসেনি তা নয়, যমুনা নদীর ভাঙন, অষ্টাশির বন্যার খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে। কিন্তু একের প্রতি অন্যের আন্তরিকতার ছোঁয়ায় বিপর্যয়ের দুঃখও যেন ফিকে হয়ে গেছে।

এর আগে রসুইঘরের রোয়াক বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এটি তার দ্বিতীয় খণ্ড। এখানেও সমাজ-সংসারে মানুষের জন্য মানুষের দরদ। ঠাকুমা আর গ্রামের বাড়ির জন্য, গ্রামীণ আন্তরিক পরিবেশের জন্য সব মনোযোগের কেন্দ্রে থাকা বালিকার উচাটন মনের মুখিয়ে থাকা। সেই সঙ্গে আশপাশের মানুষগুলোর ভালোমন্দ নিয়ে গভীর মমতা জড়ো করে ভেবে যাওয়া। বন্ধুর জন্য অকাতরে প্রিয় জিনিসটাকে বিসর্জন দেওয়া; প্রকৃতির রংরূপ মুঠোবন্দি করার একাগ্রতা, কী নেই এতে! বইটির সাথে পাঠক নিজেকে অনায়াসেই সংযুক্ত করে নিতে পারবেন। ছোট্ট মনির শৈশব হাতঘুরে অনেকের হয়ে উঠবে। মা, ঠাকুমা, কহিনূর ফুপু, মনি পিসি, গুলেনূর দাদি কাউকেই অচেনা মনে হবে না। বরং তারা খুব চেনা। তাই বাড়ির লাল বারান্দায় পড়া পাতে বসে যেতে বিন্দুমাত্র সংকোচ জাগবে না। পাতে পড়া ঝিঙেশাইল চালের ভাত ঝিঙেশ্বরী, তেলকই কিংবা পুঁইমাটুলি আর শেষ পাতে পেরাকির পায়েসের স্বাদে মনে মনে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেও দেরি হবে না। রসুইঘরের রোয়াক তাই আর স্মৃতি ভদ্রের একার বই হয়ে থাকবে না। কল্পনায় সে রোয়াকে জমায়েত হতে চাইবেন অনেকেই।

বাংলা ভাষায় রসুইঘরের রোয়াকের মতো বই ইতঃপূর্বে লেখা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। ইংরেজি ভাষায় খাবারদাবারকে ব্যাকড্রপে রেখে লেখা বই আছে। ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা এবং শিল্পী জর্জ ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যাটকিনসনের লেখা, *"কারি অ্যান্ড রাইস" অন ফোরটি প্লেটস, অর দ্য ইনগ্রেডিয়েন্টস অব সোশ্যাল লাইফ অ্যাট "আওয়ার স্টেশন" ইন ইন্ডিয়া*, বইটির কথা বলা যায়। রসপূর্ণ ভাষায় লেখা এই বইটিতে লেখক ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বর্ণনার পাশাপাশি মুখরোচক ও মশলাদার নানা খাদ্যের

বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে তিনি মূলত ব্রিটিশ শাসনের সময় তৎকালীন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বে, প্রাচ্যের এই তিনটি প্রদেশে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। নজরকাড়া প্রচুর ছবিতে বইটি অলংকৃত। এছাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শেফ এবং সুলেখক আসমা খানের *আস্মু* বইটির কথাও উল্লেখ করা যায়। দারুণ সব ছবি আর স্মৃতিময় গল্পে আস্মু ভীষণ সুখপাঠ্য একটি বই। বইটি লেখক তাঁর মায়ের প্রতি সম্মান জানিয়ে উৎসর্গ করেছেন। রসুইঘরের রোয়াক বইটিও যেন লেখকের সকল আনন্দের ছায়াসঙ্গী ঠাকুমা আর তাঁর ঝলমলে শৈশবের প্রতি একটি নীরব ট্রিবিউট বিশেষ।

রসুইঘরের রোয়াকের দ্বিতীয় খণ্ডে সময় উজিয়ে বিগত দিনের সমাজ, সংস্কৃতি, জীবন তথা আত্মগত ধারাবিবরণী স্মৃতি ভদ্র উপস্থিত করেছেন জাদুময় ভাষা আর দারুণ দক্ষতায়। রসুইঘর এখানে নারীর একান্ত আপনার থাকেনি, রোয়াক ছাড়িয়ে লেখার পরতে পরতে উঠে এসেছে হারানো দিন, ঘর-মন ভরতি মানুষের আন্তরিক সহাবস্থানের পাঁচালি। তাই এই বইটিকে শুধুমাত্র 'বাঙালির হাজার বছরের শান্ত সিগ্ধ, সুখী গার্হস্থ্য গাঁথা' বলা যাবে না, বরং বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতির একটি দলিল হিসেবে এই বই গুরুত্বের দাবিদার। আমার স্থির বিশ্বাস প্রথম খণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডটিও পাঠকের কাছে আদৃত হবে। সুখপাঠ্য এমন একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে হার্দিক অভিনন্দন। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

নাহার তৃণা
ডিসেম্বর, ২০২৩
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইলিনয়

পাতায় মোড়া ইলিশ, লাউপাতায় সর্ষে মাখা ইলিশ ভাপা

লাল রোয়াকের সেই বাড়িটা ছেড়ে চলে এলেও কারণে-অকারণে ঠিকই ডাক আসে সেখানে ফেরার। হোক তা অল্প সময়ের জন্য অথবা লম্বা ছুটির অবসরে।

আর সে সুযোগ আসা মানেই আমার অসংখ্য আবদারের লম্বা তালিকা, 'মা, এবার কিন্তু শহরে ফেরার সময় মনি পিসিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।' অথবা, 'এবার চড়কপূজার মেলা থেকে আমার নতুন খেলনাবাটি কিনতে হবে কিন্তু। ঠাকুমার কিনে দেওয়া মাটির কড়াইটা সেই কবে ভেঙে গেছে!' আবার কখনো অসম্ভব কিছু চেয়ে সবাইকে বিব্রতও করে দিতাম নিজের অজান্তেই।

'মা, এবার আমি আর ফিরব না এখানে। এখানকার স্কুল আমার ভালো লাগে না। আমার কোনো খেলার সঙ্গী নেই তো এখানে।'

আসলে ঘুরতে যাওয়া নয়, সুযোগ পেলেই ফিরে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা আমার।

রোজার ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার ফুরসত এলো।

যতই আমি ফিরে যেতে চাই না কেন, তা যে অসম্ভব মা ঠিকই জানে। এজন্য আমার কথাতে হুঁ হ্যাঁ করে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নেওয়ার তাড়া দেয়। আর বাড়িতে ফেরার গোছানো তো আর খুব অল্পতে হয় না, সে এক বিশাল আয়োজন।

আমি নতুন পেনসিলখানা নিয়ে নিই ইতুর জন্য, অমলদার দোকান থেকে নাবিস্কো বিস্কুটের প্যাকেটের বেঁচে যাওয়া কয়েকখানা বিস্কুট মনি পিসির জন্য, মসজিদের মাঠে কুড়িয়ে পাওয়া কাঁচামিঠে আমটা শুক্লার জন্য আর নতুন লাল চিরুনিটা ঠাকুমার জন্য।

মা যতই বলুক, 'ওগুলো রেখে দাও, ওদের জন্য বাবা বসাক স্টোরস থেকে সবকিছু আজই কিনে আনবে।' আমি তা শুনলে তো!

সে তো বাবা দেবে, তাই বলে কি আমি ওদের জন্য কিছু নেব না?

আমি শুধু জিনিসই গোছাই না, শহরের কত শত গল্পও মনে মনে গুছিয়ে নিই ওদের বলার জন্য।

আমায় বলতে হবে তালুকদার চাচির মেহেদি রাঙা চুলের গল্প, বলতে হবে মসজিদের বারান্দায় সারা দিন বসে থাকা সাদা চুল আর দাঁড়ির সামাদ দাদুর গল্প। ও হ্যাঁ, আরও বলতে হবে কবিতা আর শিল্পী নামের যমজ ওই দুই আপার কথা, যারা দেখতে হুবহু এক—শুধু পার্থক্য মুখের ভাষায়।

একজনের মুখে সারা দিন কত রকম শব্দ আর আরেকজন শব্দের অভাবে বড্ড শান্ত।

এত সব গল্প জুগিয়ে আমি অধীর হয়ে অপেক্ষায় থাকি কবে আসবে ছুটি।

শীত ফুরিয়ে গেলেও, এখনো বাতাসে রোদের হলকা লাগেনি। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় রহিম চাচা তার রিকশায় আমাকে বসিয়ে দেয় যত্ন করে। এরপর প্রশ্ন করে, 'মা, যামু?'

আমি রিকশার হুড শক্ত করে ধরে হ্যাঁ বলতেই রহিম চাচা প্যাডেলে পা চালায়।

সাথে সাথেই বাতাস কেটে এগোতে থাকি আমি। সে বাতাসে গা শিউরে না উঠলেও কোথাও যেন একটু হিম মিশেই থাকে। তবে স্কুল থেকে ফেরার সময় কিন্তু রোদ বেশ তেড়েফুঁড়েই ওঠে। গাছের নতুন পাতাগুলো যেন সেই রোদের তেজে খানিকটা মিইয়ে যায়।

আমাদের ভাড়াবাসার কলঘরটা লম্বাটে উঠোনের শেষ মাথায়। উঠোনে সারা দিনই রোদের আনাগোনা থাকলেও কলঘরটায় সারা সময়ই ছায়া লেপটে থাকে। উঁচু মাথার জামরুল আর জামগাছে ঘেরা কলঘরটায় প্রচণ্ড গরমেও স্নান করতে কেমন গা শিনশিন করে। চৌবাচ্চায় ধরে রাখা টাইম কলের জল সব সময়ই খুব ঠান্ডা।

কিন্তু আজ আমার সে জলের দিকে খেয়াল নেই। স্নান করে খেতে না খেতেই বাবা চলে আসবে অফিস থেকে। দুপুর পড়ার আগে বাস ধরতে পারলে বেলা বুজে আসার আগেই আমরা বাড়ি পৌঁছে যাব।

তাই আমি কোনো রকমে চৌবাচ্চা থেকে কয়েক ঘটি জল মাথায় ঢেলে বেরিয়ে আসি। মা বারান্দায় নকশা করা চটের আসন পেতেছে। তার সামনে কাঁসার জলের গ্লাস আর ভাতের থালা। আজ দুপুরের পদে হাঁসের ডিম কষা, আলুর ঝুরি ভাজা আর পাঁচফোড়নে লাউঘণ্ট।

পাতের ভাত ফেলেছেড়ে শেষ করি আমি।

এখন কি আমার খাবার সময় আছে? ব্যাগে পেনসিলখানা, আমটা আর চিরুনিখানা ঠিকঠাক উঠল কি না দেখতে হবে তো। সেসব খুঁজে দেখতে ব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ে ম্যানোলা স্নো, মিল্লাত পাউডার, রবিন লিকুইড

ব্লু আর বল সাবান। সাথে বেলা বিস্কুটের প্যাকেট। বাবা সব এনেছে বাড়ির জন্য।

সেসবের ভিড়ে অবশ্য উঁকি দিচ্ছে আমার আধা ফুরানো নাবিস্কো বিস্কুটের প্যাকেট, নতুন পেনসিলটা আর কাঁচামিঠে আমটাও।

সেসব নিয়ে আমরা যখন বাসে করি ছুটছি বাড়ির দিকে, তখন সূর্য মাঝ আকাশ থেকে সরে গেছে অনেকটাই। বাস ছুটছে দু-পাশে সদ্য গজিয়ে ওঠা পাটগাছ ভরা মাঠগুলোকে পেছনে রেখে। আর পথের দু-পাশে কিছু সময় পরপরই লাল কৃষ্ণচূড়ায় নিজেকে সাজিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডালপালা ছড়ানো গাছ।

তবে সেসবে আমার মন ভরে না। আমি অপেক্ষায় কখন দেখা যাবে সেই প্রাচীন বটগাছটা।

দুপুরের ভাতঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে। সাথে ছুটে চলা বাসের দুলুনি। বাসের খোলা জানালা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে বাতাস।

সেই বাতাসে সুতার রঙের ঘ্রাণ ভেসে আসতেই বুঝি—আর বেশি দূর নয় আমার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য। বাস কন্ডাক্টর হাঁকে, 'তালগাছি, তালগাছি।'

আমার চোখ লেগে আসে। ঘুম ভাঙে মায়ের ডাকে, 'মনি, ওঠো। আমরা চলে এসেছি।'

হ্যাঁ, তাই তো! ওই তো বটগাছটা। আর ঢালু বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের বাড়িতে জায়গির থাকা সঞ্জীব কাকু।

বাজারের ঢালু রাস্তা গিয়ে শেষ হয় রূপবাণী সিনেমা হলের সামনে। এরপর কালীবাড়ির মোড় পেরোলেই দেখা যায় দেবদারু বাগানের মাথা।

এই তো, আরেকটু এগোলেই বাইরবাড়ি।

সেখানে মাড়হীন কাপড়ে ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ঠাকুমা।

আমি রিকশা থেকে নেমে ছুটে যাই।

'ও দিদি, আস্তে আসো, পড়ে যাবে তো।'

তাতে কি আমার ছুটে যাওয়া থামে!

'ও ঠাকুমা, তুমি এখনো গা ধোওনি?'

বিকেলে সব সময়ই ঠাকুমা গা ধুয়ে মাড় দেওয়া টানটান শাড়ি পরে। মুখে তিব্বত স্নো মেখে লাল সিঁদুরের টিপ পরে কপালে। আজ তো সেসব কিছুই করেনি।

'আমার দিদিকে দেখব, সেজন্য সেই কোন দুপুর থেকে বাইরবাড়ি দাঁড়িয়ে আছি।'

কথা শেষ করেই ঠাকুমা আমার হাত টেনে ভেতর বাড়িতে নিয়ে গেল। হাতমুখ ধুইয়ে লাল বারান্দায় পিঁড়িতে বসিয়ে দিল। মনি পিসি নিয়ে এলো গন্ধরাজ লেবুপাতা আর গুড় মেশানো যবের ছাতুর শরবত। সঙ্গে খইয়ের বড়া।

মনি পিসির এ কদিনে আরেকটু গিন্নিপনা হয়েছে! আমাকে কেমন বারবার বলছে, 'এমন শুকিয়ে গেছিস কেন? খাওয়াদাওয়া কেন ঠিকমতো করিস না? চুলগুলো এমন রুক্ষ হয়ে গেছে কেন? মাকে কেন তেল দিতে দিস না?'

কীভাবে বলি, শহরে কোনো কিছু করতেই আমার ভালো লাগে না। মা তো তেল দিয়ে চুল বেঁধে দিতে দিতে ঠাকুমার মতো গল্প শোনায় না, ভাত খাবার সময় কেউ বলে না, 'গিন্নি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আজ বিকেলে আইনুল আসবে গুড়ের নই নিয়ে।'

সেসব কথা নিজের মধ্যে রেখেই আমি লাল বারান্দা থেকে উঠোনে নেমে আসি। ঢেঁকিপাড়টা এ কদিনে কি আরেকটু উঠোনের এপাশে সরে এসেছে? নাকি বেদানা গাছের একপাশ শুকিয়ে উঠোনটা বড় হয়ে গেছে?

এসব ভাবনা মনে জেঁকে বসার আগেই মনি পিসির ডাক, 'মনি, বাগানে আয়।'

ঠাকুমা ততক্ষণে রান্নাঘরে চলে গেছে।

আজ বাঘকাকু হাট থেকে অবেলায় ইলিশ নিয়ে এসেছে আমরা আসব বলে। লাউপাতায় ইলিশ ভাপা হবে। বাগানের লাউয়ের মাচা থেকে কচি কয়েকটি লাউপাতা ছিঁড়ে আনি আমরা।

মা শিলপাটায় কাঁচা মরিচ লবণ মিশিয়ে রাইসর্ষে বাটছে। ঠাকুমার কথায়, ভাপা ইলিশের স্বাদ রাইসর্ষেতে আরও খোলে।

উনুনে ফুটছে লাল আউশ চালের ভাত। বড় বউমা মাছটা কেটে ধুয়ে ততক্ষণে ঠাকুমার হাতের কাছে রেখে দিয়েছে।

উঠোনের রোদে পেয়ারাগাছের ছায়া ততক্ষণে ফুরিয়ে গেছে।

লালচে রোদটুকু দেবদারু বাগানের মাথায় একটু জিরিয়ে নিচ্ছে একটু। খানিকপরেই তো সেই রোদটুকু তলিয়ে যাবে দেবদারুর সবুজ বাগানের গহিনে।

লাউপাতার শিরা ফেলে দু-হাতে পাতাগুলো একটু ঘষে নরম করে নেয় ঠাকুমা। এরপর মিহি করে বাটা রাইসর্ষের ভেতর অল্প একটু হলুদ গুঁড়ো আর অনেকটা সর্ষের তেল মিশিয়ে দেয় ঠাকুমা। তাতে পড়ে লবণ মাখানো